তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী। এটি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল, বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়ত ও রহমত। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা এটি মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর নাজিল করেছেন। আর নবি করিম (সা.) আমাদের নিকট এ পবিত্র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর তা'আলার আদেশ-নিষেধ নিজে আমল করে তিনি আমাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মানুষের নিকট এ বাণীর মর্ম ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে বলা হয় হাদিস। হাদিস আল কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। ইসলামি বিধি-বিধান পূর্ণরূপে পালন করার জন্য আল-কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।

আল কুরআন

ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধানের মূল উৎস হলো আল-কুরআন। এটি শরিয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস। এর উপরই ইসলামি শরিয়তের মূলভিত্তি ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মৌলিক নীতিমালা আল কুরআনে বিদ্যমান। এসব মৌলিক নীতিমালার আলোকেই ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ: 'আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ।' (সূরা আন নাহল, আয়াত : ৮৯)

আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর এ কিতাব নাযিল করেন। এ কিতাব আরবি ভাষায় নাজিলকৃত। ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস হিসেবে আল-কুরআনে মানবজাতির জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট মূলনীতি ও নির্দেশনা বিদ্যমান।

কুরআন মাজিদ সহজ ও সাবলিল ভাষায় নাযিলকৃত। এতে কোনরূপ অস্পষ্টতা, বক্রতা কিংবা জটিলতা নেই। বরং এতে খুবই সুন্দর ও সরল ভাষায় নানা বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। অতি সাধারণ মানুষও এ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আল কুরআনের পরিচয়

'কুরআন' (اَلْقُرْاٰن) শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো বহুল পঠিত। আল-কুরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত কিতাব। প্রত্যেক দিন কোটি-কোটি মুসলমান এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এ গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন সূরা ও আয়াত পাঠ করে থাকি। এ জন্য এ কিতাবের নাম রাখা হয়েছে 'আল-কুরআন'। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তাকেই আল-কুরআন বলা হয়।

আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী। এটি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল, বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়ত ও রহমত। আল্লাহ তা'আলা মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে এটি নাজিল করেন। আসমানি কিতাব সমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষ নাজিল করা হয়েছে। এরপর আর কোনো কিতাব আসেনি। আর ভবিষ্যতেও আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের বিধি-বিধান ও শিক্ষা বলবৎ থাকবে। এটি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হিদায়াতের উৎসস্বরূপ। আল-কুরআনের নির্দেশনা মেনে চললে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি ও সম্মান পাবে। আর আখিরাতে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۙ

অর্থ: 'এই কিতাব আমি নাযিল করেছি, যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।' (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫৫)

আল কুরআন অবতরণ

আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। আল্লাহ তা'আলা ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রমযান মাসের ২৭ তারিখ লাইলাতুল

ক্বদর বা মহিমান্বিত রাতে কুরআন মাজিদ নাযিল করা শুরু করেন। আমরা এ রাতকে শবে কদরও বলে থাকি। এটি লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۙ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۠

অর্থ: 'বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।'(সূরা আল বুরূজ, আয়াত: ২১-২২)

আল কুরআন আল্লাহর বাণী যা তিনি আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন। কারণ, আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ভাষা ছিলো আরবি। তিনি আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় গোটা আরব ছিল অজ্ঞতা ও বর্বরতায় আচ্ছন্ন। তারা মূর্তির পূজা করত। নবি করিম (সা.) আরবদের এরূপ অজ্ঞতা ও বর্বরতা পছন্দ করতেন না। তিনি সব সময় সত্য ও সুন্দরের অনুসন্ধান করতেন। এ জন্য তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই তাঁর নিকট সর্বপ্রথম কুরআনের বাণী নাজিল হয়। তিনি সত্যের সন্ধান পান। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে মনোনীত করেন এ সময় মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আ.) সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন। এটাই ছিল সর্বপ্রথম ওহি। তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজন অনুসারে আল কুরআনের বিভিন্ন অংশ অল্প অল্প করে নাযিল করেন। কখনো ৫ আয়াত, কখনো ১০ আয়াত, কখনো আয়াতের অংশবিশেষ, আবার কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা একসাথে নাযিল হতো। এভাবে দীর্ঘ ২৩ বছরে আল কুরআন সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়।

আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব

আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তা'আলা নিজে আল কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক।' (সূরা আল হিজর, আয়াত: ৯)

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আল কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এ জন্য আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর), হরকত বা নুকতারও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। পবিত্র কুরআন সেই প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত অগণিত হাফেযের মাধ্যমেও সংরক্ষিত আছে। কেউ ভুল করলে সাথে সাথে অন্যরা-এমনকি সালাত অবস্থায়ও সংশোধন করে দেন।

আল কুরআন সংরক্ষণ

কুরআন মাজিদের কোনো অংশ নাযিল হলে সর্বপ্রথম মহানবি (সা.) তা নিজে মুখস্থ করে নিতেন। এরপর তা সাহাবিগণকে মুখস্থ করতে বলতেন। মহানবি (সা.)-এর উৎসাহ ও নির্দেশে সাহাবিগণ আল-কুরআন মুখস্থ করতেন, দিনরাত তিলাওয়াত করতেন, নামাযে পাঠ করতেন এবং পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবদের মুখস্থ করাতেন। এভাবে আল-কুরআন সর্বপ্রথম মুখস্থ করার মাধমে সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, তৎকালীন আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তারা কোনো জিনিস শিখলে তা আর কখনো ভুলত না। সম্ভবত আল কুরআন মুখস্থ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এরূপ অসাধারণ স্মরণশক্তি দান করেছিলেন। তাদের এ অসাধারণ স্মরণশক্তির কারণে কুরআন মাজিদ সহজেই তাদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হয়।

আল কুরআন লেখনীর মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা হয়। কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হলে তা মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখে রাখার জন্যও নবি করিম (সা.) নির্দেশ দিতেন। যে সকল সাহাবি লিখতে জানতেন তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁদের বলা হয় কাতিবে ওহি বা ওহি লেখক। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। প্রধান ওহি লেখক সাহাবি ছিলেন হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.)। ওহি লেখক সাহাবিগণের মধ্যে কেউ না কেউ সদা সর্বদা নবি (সা.)-এর সাথে থাকতেন। কুরআনের কোন অংশ নাযিল হলে তাঁরা সাথে সাথেই তা লিখে রাখতেন। সেসময় কুরআন মাজিদ খেজুর গাছের ডাল, পশুর হাড়, চামড়া, ছোট ছোট পাথর ইত্যাদিতে লিখে রাখা হতো।

আল কুরআন সংকলন

মহানবি (সা.) এর সময়ে আল কুরআন মুখস্থ ও লেখনীর মাধ্যমে পুরোপুরি সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু সে সময় তা একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ হয়নি। বরং তাঁর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ টুকরোগুলো নানাজনের নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-ই সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তাঁর সময় ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের বহুসংখ্যক হাফিজ শাহাদাৎবরণ করেন। এ অবস্থা দেখে হযরত উমর (রা.) ভাবলেন কুরআনের হাফিজগণ এভাবে ইন্তেকাল করলে কুরআনের অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কে কুরআন সংকলনের পরামর্শ দেন। হযরত উমর (রা.) এর পরামর্শক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। তিনি প্রধান ওহী লেখক সাহাবি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) কে সাহাবিদের নিকট সংরক্ষিত কুরআনের লিখিত অংশগুলো একত্র করেন। পাশাপাশি তিনি কুরআনের হাফিজগণের সাহায্যও গ্রহণ করেন। কুরআনের প্রতিটি অংশ তিনি লেখনী ও মুখস্থ উভয় পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে দেখেন। এভাবে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে আল কুরআনের প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। আল কুরআনের এ কপিটি খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর তা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকে। হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর এ কপিটি তাঁর মেয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত থাকে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তাঁর সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্য ছিল বিশাল-বিস্তৃত। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ও দেশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানা অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে আল কুরআনের একক ও প্রামাণ্য পাঠরীতি প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে আরও সাতটি অনুলিপি প্রস্তুত করেন। এরপর বিভিন্ন প্রদেশে আল কুরআনের একটি করে কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পবিত্র কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মুসলমানদের অনৈক্য দূর হয়। আল কুরআন সংরক্ষণের এরূপ অসামান্য অবদানের জন্য হযরত উসমান (রা.) কে 'জামিউল কুরআন' বলা হয়। জামিউল কুরআন অর্থ কুরআন সংকলক বা কুরআন একত্রকারী।

তাজবিদ

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অনেক। এটি নফল ইবাদাতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদাত। কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

অর্থ: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে, সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকির পরিমাণ হলো দশগুণ।' (তিরমিযি)

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ বা বর্ণ তিলাওয়াতের দশটি করে সাওয়াব লেখা হয়। যেমন:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম) -এর মধ্যে ১৯টি বর্ণ রয়েছে। কেউ যদি এটি তিলাওয়াত করে তবে সে (১৯×১০) = ১৯০টি নেকি লাভ করবে।

কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে তাজবিদ অনুসারে। আল কুরআনকে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুযায়ী শুদ্ধ ও সুন্দররূপে পাঠ করাকে তাজবিদ বলে। তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া ওয়াজিব বা আবশ্যক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

অর্থ: 'কুরআন তিলাওয়াত করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।' (সূরা আল-মুযাম্মিল, আয়াত: ৪)

তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে গুনাহ হয়। এতে অনেক সময় কুরআনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। আর অশুদ্ধ তিলাওয়াতের ফলে সালাতও পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাই আমাদেরকে অবশ্যই তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।

তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াতের বেশ কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন: মাখরাজ, সিফাত, মাদ্দ, ওয়াকফ, গুন্নাহ ইত্যাদি। পূর্ববর্তী শ্রেণিসমূহে আমরা তাজবিদের বেশকিছু নিয়ম সম্পর্কে জেনেছি। এ শ্রেণিতে আমরা মাদ্দ ও ওয়াকফ সম্পর্কে জানব।

মাদ্দ

মাদ্দ শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা, লম্বা করা। তাজবিদের পরিভাষায় মাদ্দের হরফের ডান দিকের হরকতযুক্ত হরফ লম্বা করে পড়াকে মাদ্দ বলা হয়। মাদ্দ বিশিষ্ট হরফটি উচ্চারণকালে শ্বাস এবং আওয়াজকে দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

মাদ্দের হরফ মোট তিনটি। যথা- আলিফ, ওয়াও, ইয়া (ا – و – ى) ।

এ তিনটি হরফ নিম্নলিখিত অবস্থায় মাদ্দের হরফ হিসেবে উচ্চারিত হয় :
(ক) ا (আলিফ)-এর পূর্বের হরফে যবর (ـَ) থাকলে। যেমন: بَا
(খ) و (ওয়াও)-এর উপর জযম (ـْ) এবং তার ডান পাশের হরফে পেশ (ـُ) থাকলে। যেমন: بُوْ
(গ) ى (ইয়া)-এর উপর জযম (ـْ) এবং এর ডান পাশের হরফে যের (ـِ) থাকলে। যেমন: بِيْ
উপর্যুক্ত তিনটি অবস্থায় ا- و - ى মাদ্দের হরফ হিসেবে গণ্য হয়। ফলে এর পূর্বের অক্ষর একটু দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

প্রকারভেদ

মাদ্দ প্রধানত দুই প্রকার। যথা-
১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)
২. মাদ্দে ফারঈ (শাখা মাদ্দ)

নিম্নে এ দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো:
১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ):
ওয়াও সাকিনের পূর্বের হরফে পেশ, আলিফের পূর্বের হরফে যবর এবং ইয়া সাকিনের পূর্বের হরফে যের থাকলে তাকে মাদ্দে আসলি বলে।
অন্যভাবে বলা যায়, মাদ্দের হরফের পূর্বে বা পরে জযম (ـْ) বা হামযা (ء) কিংবা তাশদিদ (ـّ) না থাকলে তাকে মাদ্দে আসলি বলে। মাদ্দে আসলিকে মাদ্দে তাবয়িও বলা হয়। এরূপ মাদ্দে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

উল্লেখ্য, একটি সোজা আঙুলকে স্বাভাবিকভাবে বাঁকা করে হাতের তালুতে লাগাতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে এক আলিফ পরিমাণ সময় বলে। এভাবে দুই, তিন ও চার আলিফ পরিমাণ সময় নির্ধারণ করা যায়।
উদাহরণ: نُوْحِيْهَا

এ শব্দটিতে একসাথে মাদ্দে আসলির তিন ধরনের উদাহরণ রয়েছে। যেমন,
(ক) نُوْ এখানে و (ওয়াও) -এর উপর জযম (ـْ) এবং তার পূর্বের হরফ ن (নুন)-এর উপর পেশ (ـُ) রয়েছে।
(খ) حِيْ এখানে ى (ইয়া)-এর উপর জযম (ـْ) এবং তার পূর্বের হরফ ح (হা)-এর নিচে যের (ـِ) রয়েছে।
(গ) هَا এখানে ا (আলিফ) -এর পূর্বের হরফ ه (হা)-এর উপর যবর (ـَ) রয়েছে।

এ তিনটি ক্ষেত্রেই মাদ্দের হরফ ا- و - ى এর পূর্বে বা পরে জযম (ـْ) বা, হামযা (ء) বা তাশদিদ (ـّ) নেই। সুতরাং এগুলো মাদ্দে আসলি। এরূপ অবস্থায় ن ه – ح (নুন, হা, হা) অক্ষরকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

কুরআন মাজিদের যে সকল হরফের উপর খাড়া যবর (ـٰ),নিচে খাড়া যের (ـٖ) এবং উপরে উল্টা পেশ (ـٗ) রয়েছে, সে সকল হরফকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন:

اِلٰهِ النَّاسِ

لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ

مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ

এখানে ل (লাম) হরফের উপর খাড়া যবর (ٰ), ه (হা) হরফের নিচে খাড়া যের (ٖ) এবং ه (হা) হরফের উপর উল্টো পেশ (ٗ) রয়েছে। সুতরাং, ه - ه ل -(লাম, হা, হা) হরফগুলোকে এক আলিফ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

২. মাদ্দে ফারঈ (শাখা মাদ্দ):
ফারঈ অর্থ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। মাদ্দে আসলি থেকে যে সকল মাদ্দ বের হয় তাকে মাদ্দে ফারঈ বলে। অর্থাৎ মাদ্দের হরফের পরে জযম (ـْ) বা হামযা (ء) বা তাশদিদ (ـّ) থাকলে সেসব স্থানে দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে মাদ্দে ফারঈ বলে।

উদাহরণ
(ক) اٰلْاٰنَ - এ শব্দে মাদ্দের হরফ এর পর লাম হরফে জযম (ـْ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ। অতএব, আমরা এ স্থানে হামযাকে লম্বা করে পড়ব।

(খ) جَآءَ – وَمَا اَدْرٰكَ - এ উদাহরণ দুটিতে মাদ্দের হরফ আলিফ-এর পর হামযা এসেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে জিম (ج) ও মীম (م) হরফকে মাদ্দে ফারঈ হিসেবে দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

(গ) كَآفَّةً – وَلَا الضَّآلِّيْنَ আলোচ্য উদাহরণদ্বয়ে মাদ্দের হরফ আলিফ এর পর লাম (ل) এবং ফা (ف) হরফে

তাশদিদ (ـّ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ- এর অন্যতম রূপ। এরূপ ক্ষেত্রেও হরফকে লম্বা করে পড়তে হবে।

উল্লেখ্য, আল-কুরআনের অনেক স্থানে হরফের উপর এসব মাদ্দের চিহ্ন দেওয়া থাকে। যেমন: ~, ⌒হরফের উপর এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফকে লম্বা করে পড়তে হয়। হরফের উপর (⌒) চিহ্ন থাকলে চার আলিফ এবং (~) চিহ্ন থাকলে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন: اُوْلٰٓئِكَ – مَآ اَغْنٰى

জোড়ায় কাজ: কুরআন তিলাওয়াতে তাজবিদের গুরুত্ব সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।
দলগত কাজ: মাদ্দের প্রকারভেদের একটি তালিকা তৈরি করো।
বাড়ির কাজ: মাদ্দের নাম ও কোন মাদ্দ কয় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয় তা লেখ।

ওয়াকফ

ওয়াকফ আরবি শব্দ। এর অর্থ থেমে যাওয়া, বিরতি দেওয়া, স্থগিত রাখা ইত্যাদি। তাজবিদের পরিভাষায় কুরআন তিলাওয়াতের সময় কোনো আয়াত বা শব্দের শেষে প্রয়োজন অনুসারে থেমে যাওয়া বা বিরতি দেওয়াকে ওয়াকফ বলে। অন্য কথায়, দুই নিশ্বাসের মধ্যবর্তী বিরতির সময়কে ওয়াকফ বলা হয়। ওয়াকফ যে হরফের উপর করা হয় সে হরফে সাকিন না থাকলে সাকিন করে ওয়াকফ করতে হয়।

কুরআন তিলাওয়াতের মাঝে এরূপ ওয়াকফ করা খুবই জরুরি। কেননা কোনো কোনো সময় ওয়াকফ না করে মিলিয়ে পড়লে আয়াতের অর্থই পরিবর্তন হয়ে যায়।। তা ছাড়া আমরা বেশি সময় নিশ্বাস ধরে রাখতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর আমাদের শ্বাস নিতে হয়। তিলাওয়াতের সময়ও এক শ্বাসে পুরো তিলাওয়াত করা সম্ভব নয়। এ জন্য আয়াতের মধ্যে থামতে হয়। আয়াতের মধ্যে এরূপ বিরতি নেওয়াকেই ওয়াকফ বলে।

আল কুরআনকে সুন্দর ও শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করতে হবে। সেজন্য তিলাওয়াতকালে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থামা যাবে না। তাতে কুরআন তিলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। নির্ধারিত স্থানে ওয়াকফ করতে হবে। তবে কেউ অপারগ হলে বা শ্বাস রাখতে না পারলে নির্ধারিত স্থানের পূর্বেই ওয়াকফ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তিলাওয়াত করার সময় পুনরায় যে শব্দে ওয়াকফ করেছে, সে শব্দ থেকে তিলাওয়াত করতে হবে।

আমাদের প্রিয়নবি (সা.) সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াতের পর ওয়াকফ করতেন। অন্যান্য সুরা তিলাওয়াতের সময় থেমে থেমে ধীরস্থিরভাবে সুন্দর করে তিলাওয়াত করতেন। আমাদেরও ঠিক সেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত।

আল-কুরআনে ওয়াকফের নানারকম চিহ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হলো বিরাম চিহ্ন। এগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে শুদ্ধভাবে ওয়াকফ করা যায়। নিম্নে এ চিহ্নসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো।

○ - এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াকফ তাম'। এটি বাক্য বা আয়াতের চিহ্ন। অর্থাৎ এ চিহ্ন দ্বারা আয়াত শেষ হওয়া বোঝা যায়। এ চিহ্নে থামতে হবে।

م - একে 'ওয়াকফ লাযিম' বলে। এ চিহ্নে ওয়াকফ করা অত্যাবশ্যক। এতে ওয়াকফ না করলে আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

ط- এটি 'ওয়াকফ মুতলাক'- এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নে ওয়াকফ করা উত্তম।

ج - এটি 'ওয়াকফ জায়িজ'-এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা কিংবা না থামা উভয়ই জায়েয। তবে এতে ওয়াকফ করা ভালো।

ز - একে 'ওয়াকফ মুজাওওয়াজ' বলে। এ চিহ্নে না থামা ভালো।

ص - এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াকফ মুরাখখাস'। এখানে না থামা ভালো। তবে অপারগ হলে এ স্থানে থামা যাবে।

ق - এ চিহ্নে থামা ও না থামা প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। তবে এতে না থামা ভালো।

قف - এটি ওয়াকফ আমর। অর্থাৎ এতে থামার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে থামা উচিত।

لا - এটি না থামার নির্দেশ। এরূপ স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়তে হবে।

صل - এ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দেওয়া বা না দেওয়া উভয়ই জায়েয। তবে বিরতি দেওয়াই উত্তম।

صلى - এ স্থানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

س / سكته - এ চিহ্নের নাম সাকতাহ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে শ্বাস ছাড়া যাবে না। অর্থাৎ পড়া বন্ধ থাকবে তবে শ্বাস জারি থাকবে।

ث/ مع/معانقة - এ চিহ্নের নাম মুআনাকা। আয়াতের বা শব্দের ডানে এবং বামে (তিন বিন্দু) অথবা مع চিহ্ন থাকে। এ অবস্থায় তিলাওয়াতকালে এক স্থানে থামতে হয় এবং অপর স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়।

وقف النبي - ওয়াকফুন নাবি (সা.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে মহানবি (সা.) ওয়াকফ করেছিলেন।
وقف جبرائيل- ওয়াকফ জিবরাইল (আ.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দিলে বরকত লাভ হয়।
وقف غفران- ওয়াকফ গুফরান। এ স্থানে থামলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।
وقف منزل - ওয়াকফ মানযিল। এরূপ চিহ্নিত স্থানে মিলিয়ে পড়ার চেয়ে বিরতি দেওয়া ভালো।

নাযিরা তিলাওয়াত

কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম বা বাণী। কুরআন মাজিদ দেখে দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলে। দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত একটি উত্তম ইবাদাত। কুরআনের প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতের জন্য মহান আল্লাহ তিলাওয়াতকারীকে অন্তত দশটি নেকী দান করেন। যে ঘরে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা হয় সে ঘরে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তির মর্যাদা অনেক। এমনকি যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে যায় এবং তিলাওয়াত তার জন্য কষ্টসাধ্য হয় তাকেও আল্লাহ তা'আলা রকুরআন পাঠে দ্বিগুণ সওয়াব দেবেন বলে মহানবি (সা.) উল্লেখ করেছেন। আর যে অন্তরে কুরআন মাজিদের একটি আয়াতও নেই মহানবি (সা.) সে অন্তরকে একটি শূন্য ঘরের সাথে তুলনা করেছেন। কাজেই আমরা শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত শিখব এবং প্রত্যহ তিলাওয়াত করব।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

কুরআন মাজিদের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অতুলনীয়। সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গল এ কিতাবে বর্ণিত বিধি-নিষেধ মেনে চলার মধ্যে নিহিত। এ পবিত্র কালাম তিলাওয়াতের সময় এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। সুতরাং অত্যন্ত আদবের সাথে এ কিতাব তিলাওয়াত করা উচিত। বাহ্যিক আদব রক্ষার সাথে সাথে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। তিলাওয়াতের সময় নিজের মনকে যাবতীয় কলুষ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর অভিমুখী করে তিলাওয়াত শুরু করা উচিত। তাই কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব নিচে দেওয়া হলো:

(১) সুন্দরভাবে ওযু করে পবিত্র স্থানে কিবলামুখী হয়ে বসা।
(২) পবিত্র কুরআনকে কোন কিছুর উপরে রেখে তিলাওয়াত করা।
(৩) তিলাওয়াতের পূর্বে কয়েকবার দরূদ শরিফ পাঠ করা।
(৪) আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে তিলাওয়াত শুরু করা।
(৫) ধীরে ধীরে তাজবিদের সাথে মিষ্টি-মধুর স্বরে তিলাওয়াত করা।
(৬) তিলাওয়াতের সময় হাসি-তামাশা বা কোন রূপ কথা বার্তা না বলা।
(৭) একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করা।
(৮) তিলাওয়াত শেষে কুরআনকে খুব সম্মানের সাথে কোন উচুঁ স্থানে রেখে দেওয়া।

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআন মাজিদের কয়েকটি সূরা

সূরা আল-লাহাব (سُوْرَةُ اللَّهَبِ)

সূরা আল-লাহাব আল-কুরআনের ১১১তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৫টি। এ সূরায় কাফির আবু লাহাবের চরিত্র ও পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা লাহাব।
আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওয্যা। সে ছিল আবদুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান, রাসুল (সা.)-এর আপন চাচা। শরীরের উজ্জ্বল টকটকে রঙের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবু লাহাব। সে ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোরবিরোধী। রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সে সব সময় কষ্ট দিত। রাসুল (সা.) যখন মানুষকে ইমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে পিছে পিছে গিয়ে আল্লাহর রাসুলকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত, মাঝে মাঝে তাঁকে পাথরও ছুঁড়ে মারত।

শানে নুযুল

সূরা আল-লাহাব মক্কায় অবতীর্ণ। রাসুল (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর বাণী,

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

অর্থ: ‘আর আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।’ (সূরা আশ-শু‘আরা: ২১৪)

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মহানবি (সা.) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কোরাইশ গোত্রের উদ্দেশ্যে (وَا صَبَاحَاه) হায়! সকাল বেলার বিপদ বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। এভাবে ডাক দেওয়া তখন আরবে বিপদাশঙ্কার লক্ষণরূপে বিবেচিত হতো। ডাক শুনে কোরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হলো। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের বললেন: যদি আমি বলি যে, ‘একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল-বিকাল যে কোনো সময় তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে’, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই এক বাক্যে বলে উঠল: হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন: আমি শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভীষণ এক আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সর্তক করছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল,

تَبًّا لَكَ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا

অর্থ: ‘ধ্বংস হও তুমি! এ জন্যই কি আমাদেরকে একত্রিত করছে?’ অতঃপর সে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে পাথর মারতে উদ্যত হলো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।’ (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
تَبَّتْ	ধ্বংস হোক, বিনষ্ট হোক	ذَاتَ لَهَبٍ	লেলিহান, শিখাযুক্ত
يَدَا	দুই হাত	اِمْرَأَتُهٗ	তার স্ত্রী
يَدٌ	হাত	حَمَّالَةَ	বহনকারিণী
مَا أَغْنٰى	কোনো কাজে আসেনি, কোনো উপকার করেনি, রক্ষা করেনি	اَلْحَطَبِ	কাঠ, লাকড়ি, ইন্ধন
كَسَبَ	সে উপার্জন করেছে	جِيْدِ	গলা
سَيَصْلٰى	সে অচিরেই প্রবেশ করবে	حَبْلٌ	রশি, ফাঁস, রজ্জু
نَارًا	আগুন, দোযখ	مَسَدٍ	পাকানো, প্যাঁচানো

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ؕ ۝	১. আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।
مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ؕ ۝	২. তার ধন-সম্পদও যা সে উপার্জন করেছে, তা কোনো কাজে আসেনি।
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝	৩. শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।
وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝	৪. এবং তার স্ত্রীও (প্রবেশ করবে) যে ইন্ধন বহন করে।
فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝	৫. তার গলায় পাকানো রশি।

ব্যাখ্যা

আবু লাহাব ছিল ইসলাম ও নবি করিম (সা.)-এর চরম শত্রু। সে সর্বদাই ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। এ সূরায় তার শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। মক্কা নগরীতে সে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। সে প্রচুর ধন-সম্পদেরও মালিক ছিল। কিন্তু এত কিছুও তার কোনো কাজে আসেনি। বরং দুনিয়াতেও আবু লাহাবের ধ্বংস, আর আখিরাতেও সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তার স্ত্রী উম্মে জামিলও ছিল তারই মতো ইসলামের শত্রু। সে-ও রাসুল (সা.)-কে কষ্ট দিত। সে রাসুল (সা.)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। ফলে তার প্রতিও আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ রয়েছে এবং সে আখিরাতে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

উল্লেখ্য, এই সূরা নাজিল হওয়ার কয়েক বছর পর আবু লাহাবের পচন ধরা সংক্রামক প্লেগ রোগ দেখা দেয়। তখন সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে নির্জন জায়গায় রেখে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পচন শুরু হলে চাকর-বাকরদের দ্বারা সেখানে মাটি খুঁড়ে কাঠ দিয়ে দূর থেকে ঐ গর্তে ফেলে দেয় এবং দূর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে দাফন করা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

শিক্ষা

১. শান্তির দূত রাসুলুল্লাহ (সা.) ও ইসলামের বিরোধিতা করা খুবই মারাত্মক অপরাধ।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.) ও মানবতার ধর্ম ইসলামের বিরোধিতা করলে আল্লাহ তা'আলা চরম অসন্তুষ্ট হন।

৩. আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর মতো কাজ যারা করবে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস অনিবার্য।

৪. দুনিয়ার মানসম্মান, ধন-সম্পদ ইসলামের এসব শত্রুকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা লাহাবের শিক্ষাগুলো লিখে একটি রঙিন পোস্টার তৈরি করবে।

সূরা আন-নাসর (سُوْرَةُ النَّصْرِ)

সূরা আন-নাসর পবিত্র কুরআনের ১১০তম সূরা। এ সূরার 'নাসর' শব্দ থেকে সূরাটির নাম রাখা হয়েছে আন-নাসর। এর আয়াত সংখ্যা তিন। এই সূরা মক্কায় বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গা অনুযায়ী, যে সমস্ত সূরা হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো হলো মাদানি সূরা। এ জন্য এ সূরাও মাদানি সূরা।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اِذَا	যখন	دِيْنِ اللّٰهِ	আল্লাহর দ্বীন
جَاءَ	আসবে	أَفْوَاجًا	দলে দলে
نَصْرُ اللّٰهِ	আল্লাহর সাহায্য	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ	অতঃপর আপনি প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন
وَ	এবং, ও	رَبِّكَ	আপনার প্রতিপালকের
اَلْفَتْحُ	বিজয়	وَاسْتَغْفِرْهُ	এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন
رَأَيْتَ	আপনি দেখবেন	إِنَّهٗ	নিশ্চয়ই তিনি
اَلنَّاسَ	মানুষ	كَانَ	হন, হলেন, আছেন, রয়েছেন
يَدْخُلُوْنَ	তারা প্রবেশ করছে	تَوَّابًا	তওবা কবুলকারী
فِيْ	মধ্যে		

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١	১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়
وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢	২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣	৩. তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি তো তওবা কবুলকারী।

ব্যাখ্যা

সূরা আন-নাসর কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সম্পূর্ণ সূরা। এরপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু আর কোনো সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। এ সূরাতে মক্কা বিজয়ের পর মানুষের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা মহানবি (সা.)-এর জন্মভূমি এবং বাসস্থান ছিল। কিন্তু সেখান হতে তাঁকে এবং তাঁর সাহাবিগণকে কাফেররা হিজরত করতে বাধ্য করেছিল। যখন ৮ম হিজরিতে এই মক্কা নগরী বিজয় হল তখন লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল। অথচ এর পূর্বে এক-দুজন করে মুসলমান হতো। মক্কা বিজয়ের পর মানুষের নিকট এ বিষয়টি পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, তিনি আল্লাহর সত্য পয়গম্বর এবং ইসলামই হলো সত্য ধর্ম; যা অবলম্বন ব্যতীত পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

ইসলামের এ বিজয়ের ফলে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়তী দায়িত্বের পরিপূর্ণতাও বোঝানো হয়েছে। তাই বিশিষ্ট সাহাবীগণ এ সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত নিকটবর্তী বলে বুঝতে পেরেছিলেন। মহানবি (সা.) -এর দুনিয়াতে আগমন ও অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে বলে এ সূরায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সূরা দ্বারা আরও বোঝানো হয়েছে যে, কোনো ব্যাপারে যখন আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন, তখন অনেক অসাধ্য কাজও সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। তখন আল্লাহর তাসবিহ, প্রশংসা এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় অধিকতর মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। উম্মে সালামাহ (রা.) বলেন, এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) উঠাবসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ (সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি) এই তাসবিহ পাঠ করতেন।

শিক্ষা

এ সূরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

১. সাহায্য ও বিজয় আসে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থকে।

২. আমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।

৩. আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সফলতা লাভ করা যায় না।

৪. কোনো কাজে সফলতা আসলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত।

৫. যাবতীয় ত্রুটি, অপরাধ বা পাপ কাজের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

৬. মহানবি (সা.)-এর কোনো পাপ কখনো ছিলো না। তবুও তাঁকে ইস্তেগফার করতে বলে মূলত আমাদের তাওবা ইস্তেগফার করতে উৎসাহিত করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন।

অতএব, সকল সাওয়াবের কাজ করতে ও পাপ কাজ থেকে বাঁচতে আমরা আল্লাহর সাহায্য চাইব। যখন আমাদের সফলতা আসবে, তখন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করব। আর যদি কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সূরা আন নাসর তিলাওয়াত করবে। এরপর সূরাটির অর্থ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

সূরা আল-কাফিরুন (سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ)

পরিচয়

সূরা কাফিরুন কুরআন মাজিদের ১০৯তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এটিতে মোট ৬টি আয়াত আছে। এ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত আল-কাফিরুন শব্দ (اَلْكَافِرُوْنَ) থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।
এ সূরায় শিরক ও কুফরের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ ও কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এতে মুসলিমদের ইমানের উপর অটল ও অবিচল থাকার তাগিদ রয়েছে। কাফিরদের এ কথা জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে কাফিরদের সাথে মুসলিমদের সমঝোতার কোনো পথ খোলা নেই। তবে যে যার ধর্ম পালন করবে, এতে কোন জবরদস্তির স্থান নেই।

শানে নুযুল

ওলীদ ইবন মুগীরা, আস ইবন ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবন আব্দুল মোত্তালিব ও উমাইয়া ইবন খালফ প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তি একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল: আসুন, আমরা পরস্পরের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদাত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদাত করব। কাফিরদের এহেন প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাফিরুন অবতীর্ণ হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
قُلْ	তুমি বল/আপনি বলুন	عَابِدُوْنَ	ইবাদাতকারীগণ
يٰاَيُّهَا	হে, ওহে	اَعْبُدُ	আমি ইবাদাত করি
اَلْكَافِرُوْنَ	কাফিররা	عَابِدٌ	ইবাদাতকারী
لَا اَعْبُدُ	আমি ইবাদাত করি না	عَبَدْتُّمْ	তোমরা ইবাদাত করে আসছ
مَا	যার	لَكُمْ	তোমাদের জন্য
تَعْبُدُوْنَ	তোমরা ইবাদাত করছ	دِيْنُكُمْ	তোমাদের দীন
اَنْتُمْ	তোমরা	لِيَ	আমার জন্য

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ	১. বল, ‘হে কাফিররা!
لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ	২. আমি তার ইবাদাত করি না যার ইবাদত তোমরা করো।
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ	৩. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও, যাঁর ইবাদাত আমি করি।
وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ	৪. এবং আমি তার ইবাদাতকারী নই যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ।
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ	৫. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও, যাঁর ইবাদাত আমি করি।
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۚ	৬. তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।’

ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহ প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.) কে নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি যেন সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে কাফেরদের সামনে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে তারা যাদের ইবাদাত করে থাকে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহর ইবাদাতে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা না থাকার কারণে তারা আল্লাহর ইবাদাতই করে না। শিরকের সাথে মিশ্রিত তাদের ইবাদাতকে কোন ইবাদাতই বলা চলে না।

এখানে কেবল ঐ সমস্ত কাফেরদের বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ জানেন যে, তাদের মৃত্যু কুফর ও শিরকের অবস্থাতেই ঘটবে। কেননা-এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর কিছুসংখ্যক মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তারা আল্লাহর ইবাদাত করেছিল। কাফিররা মহানবি (সা.) এর কাছে যখন প্রস্তাব রাখল যে, এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদাত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যের ইবাদাত করবেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, এটা কখনই সম্ভব নয় যে, আমি তাওহীদের পথ পরিত্যাগ করে শিরকের পথ অবলম্বন করে নেব; যেমন তোমরা চাচ্ছ। আর যদি আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে হিদায়াত না লিখে থাকেন, তাহলে তোমরাও তাওহীদ ও আল্লাহর ইবাদাত থেকে বঞ্চিতই থাকবে। যদি তোমরা তোমাদের দ্বীন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো এবং তা ত্যাগ করতে রাজি না হও, তাহলে তার পরিণাম তোমরাই ভোগ করবে। আমার ধর্ম আমার জন্য এবং তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য।

শিক্ষা :

১. একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে।

২. কোন পরিস্থিতিতেই মুসলিমদের জন্য শত্রুর সাথে ধর্মের ব্যাপারে এমন আপস করা যাবে না যা ইসলাম সমর্থন করে না।

৩. এই সূরায় মহান আল্লাহ হক ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা সূরা কাফিরুন শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করবে এবং পরস্পরের মধ্যে এ সূরার শিক্ষা আলোচনা করবে।

সূরা আল আসর (سُوْرَةُ الْعَصْرِ)

সূরা আল-আসর আল-কুরআনের ১০৩তম সূরা। এটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা মাত্র ৩টি। পবিত্র কুরআনের ছোট সূরাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। তবে এ সূরার মর্ম ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। এ সূরার প্রথমে আল্লাহ তা'আলা আসর বা মহাকালের শপথ করেছেন। এ জন্য এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-আসর। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলিত হলে একজন অন্যজনকে সূরা আসর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। (তাবরানী) ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেছেন, 'যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কে চিন্তা করত, তবে এটি তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল'। (ইবনে কাসির) অর্থাৎ এ সূরার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে পারলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের পথ লাভ করত। সুতরাং আমরা এ সূরাটি অর্থসহ শিখব। অতঃপর এর তাৎপর্য সম্পর্কে জানব এবং তদানুযায়ী আমল করব।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
وَ	শপথ, কসম	اٰمَنُوْا	তারা ইমান এনেছে
اَلْعَصْرِ	সময়, যুগ, কাল, মহাকাল	عَمِلُوْا	তারা আমল করেছে
اِنَّ	নিশ্চয়ই, অবশ্যই	اَلصَّالِحَاتِ	সৎকর্মসমূহ
اَلْاِنْسَانَ	মানুষ	تَوَاصَوْا	তারা পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে
خُسْرٍ	ক্ষতি	اَلْحَقِّ	সত্য
اِلَّا	ব্যতীত, ছাড়া	اَلصَّبْرِ	ধৈর্য
اَلَّذِيْنَ	যারা		

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
وَالْعَصْرِ ۙ﴿١﴾	১. মহাকালের শপথ।
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ﴿٢﴾	২. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ﴿٣﴾	৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٤﴾	৪. ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

শানে নুযূল

জাহিলিয়া যুগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সাথে কালাদাহ ইবনে উসায়েদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। কালাদাহ প্রায়ই তার নিকট যাতায়াত করত। আবু বকর (রা.) ইমান গ্রহণের পর একদিন সে তার নিকট এসে বলল, 'হে আবু বকর! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তোমার ব্যবসা-বাণিজ্যে তো ভাটা লেগেছে। আয়-রোজগারের পথ তো প্রায় বন্ধ। তুমি কোন ধারণায় নিমজ্জিত হয়েছ? নিজেদের ধর্মকর্মও হারিয়েছ এবং দুনিয়াও হারিয়েছ। তুমি এখন উভয় দিক দিয়ে পূর্ণরূপে লোকসানে নিপতিত।' আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, 'হে বোকা! যে লোক আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুলের অনুগত হয়ে যায়, সে কখনো লোকসানে নিপতিত হয় না। যারা পরকাল সম্পর্কে কোনোই চিন্তাভাবনা করে না মূলত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, তারাই লোকসানে নিপতিত। যারা কেবল জাগতিক উন্নতি লাভের জন্যই সদা চিন্তামগ্ন ও ব্যস্ত থাকে, তারাই একুল-ওকুল উভয় কুলই হারায়।' আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কথার সত্যতা প্রমাণ এবং এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে আযীযী)

ব্যাখ্যা

সূরা আল-আসর একটি ছোট্ট সূরা হলেও এর মর্মার্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা মহাকালের শপথ করে বলেছেন যে, সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ব্যতীত । সেই চারটি গুণ হলো- ইমান, সৎকর্ম, পরস্পরকে সত্য অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দান।

সূরা আল-আসরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সময় বা মহাকালের শপথ করেছেন। মানুষের জীবনে সময় অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। মানুষ খুব অল্প সময় এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকে। এ সময়ের মধ্যেই মানুষকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। যারা দুনিয়াতে সময়ের সদ্ব্যবহার করবে এবং নেক আমল করবে পরকালে তারাই সফলতা লাভ করবে। তাই সময়ের শপথ করে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের এই ক্ষতি ও ধ্বংস সুস্পষ্ট। কেননা, তারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে না, আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না। যারা এরূপ মনগড়াভাবে জীবনযাপন করবে, তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তারা যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ তাদের দিনরাত মেহনত ও পরিশ্রমের সাথে অতিবাহিত হয়। অতঃপর যখন মৃত্যুবরণ করে তখনও তাদের আরাম ও শান্তি নসীব হয় না। বরং তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

তৃতীয় ও শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চারটি আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে যারা এ চারটি কাজ করবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরং তারা সফলতা লাভ করবে। আর যারা দুনিয়াতে এ কাজগুলো করবে না, তারা অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কাজগুলো হলো ইমান আনা, সৎকর্ম করা, সত্যের উপদেশ দেওয়া ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া।

এ কাজগুলোর প্রথম দুটি কাজ ব্যক্তিগত। অর্থাৎ প্রথমে ইমান আনতে হবে। তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় কাজ হলো ভালো কাজ করা। আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন তা পালন করতে হবে। আর তিনি যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার নামই নেক কাজ।

চারটি কাজের মধ্যে শেষের কাজ দুটি সামাজিক। অর্থাৎ একা একা এ কাজ দুটি করা যাবে না। এর প্রথমটি হলো সমাজের মানুষকে সত্যের উপদেশ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষকে সত্য পথের দিকে ডাকা। তাদের নেক কাজে উৎসাহিত করা, অন্যায় কাজ থেকে তাদের বিরত রাখা ইত্যাদি। সামাজিক দায়িত্বের শেষটি হলো মানুষকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া। অর্থাৎ বালা-মুসবিত ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য, শরিয়তের হুকুম-আহকাম পালন করতে ধৈর্য, পাপাচার বর্জন করতে ধৈর্য, কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া। মূলত এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে হতাশ ও নিরাশ হওয়া যাবে না। বরং ধৈর্য ধারণ করতে হবে, সত্যের পথে অবিচল থাকতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

শিক্ষা

১. সময় অত্যন্ত মূল্যবান। যারা দুনিয়াতে সময়ের সদ্ব্যবহার করবে এবং নেক আমল করবে পরকালে তারাই সফলতা লাভ করবে।
২. সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ব্যতীত । সেই চারটি গুণ হলো- ইমান, সৎকর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ দান।
৩. আমরা ইমান আনব এবং নেক কাজ করব। কোনো প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও অনৈতিক কাজ করব না।
৪. আমাদের বন্ধুবান্ধব, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে সত্য ও সুন্দরের দিকে আহ্বান করব। সবাইকে উত্তম চরিত্রবান ও নীতিবান হতে উৎসাহ দেবো।
৫. আমরা সত্যের পথে অবিচল থাকব, বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করব। হতাশ হয়ে কখনও অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করব না।
৬. আমরা পরস্পরকে সৎ কাজে উৎসাহ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেবো।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা সূরা আল আসর শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করবে এবং পরস্পরের মধ্যে এ সূরার শিক্ষা আলোচনা করবে

সূরা আত-তাকাসুর (سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ)

এ সূরার প্রথম আয়াতে বর্ণিত তাকাসুর শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা তাকাসুর। এটি পবিত্র কুরআনের ১০২তম সূরা। এর অর্থ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা। এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি। রাসুলুল্লাহ (সা.) একদা সাহাবিগণকে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ক্ষমতা কারও নেই যে সে দৈনিক এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে। উত্তরে তাঁরা বললেন, হ্যাঁ এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনেরই বা আছে? অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাসুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য, প্রতিদিন এই সূরা একবার পাঠ করা এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার সমান।' (মাযহারি)

শানে নুযূল

কুরাইশের শাখা গোত্র ছিল বনু আবদি মানাফ, বনু কুসাই ও বনু সাহম। এদের প্রত্যেক গোত্র অপর গোত্রকে লক্ষ্য করে বলত, কী নেতৃত্ব, কী ক্ষমতা কিংবা জনসংখ্যা, সব দিক থেকেই আমরা তোমাদের উপরে। এতে প্রথমে বনু আবদি মানাফই সবার উপরে প্রমাণিত হলো। শেষে সবাই বলল, আমাদের মধ্যে যারা মারা গেছে তাদেরকেও হিসাব করব। কাজেই তারা কবরস্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং কোনটা কার কবর তা বলে গুনতে শুরু করল। এবার বনু সাহমের সংখ্যায় তিন পরিবার বেশি হলো। কেননা, জাহিলি যুগে তাদের জনসংখ্যা বেশি ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সূরাটি নাজিল হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اَلْهٰكُمُ	তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করেছে, মোহাবিষ্ট করেছে	لَوْ	যদি
التَّكَاثُرُ	প্রাচুর্য, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	عِلْمَ	জ্ঞান
حَتّٰى	পর্যন্ত, যতক্ষণ না, এমনকি	اَلْيَقِيْنِ	দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চিত
زُرْتُمُ	তোমরা সাক্ষাৎ করেছ, তোমরা উপনীত হয়েছ, তোমরা মুখোমুখি হয়েছ	اَلْجَحِيْمَ	জাহিম, একটি জাহান্নামের নাম
اَلْمَقَابِرَ	কবরসমূহ	عَيْنَ	চক্ষু, চোখ
كَلَّا	কখনোই না	يَوْمَئِذٍ	সেদিন
سَوْفَ	অচিরেই, শীঘ্রই	عَنِ	হতে, থেকে, সম্পর্কে
تَعْلَمُوْنَ	তোমরা জানবে	اَلنَّعِيْمِ	নিয়ামত
ثُمَّ	অতঃপর, আবার		

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ	১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।
حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ	২.যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ	৩. এটা সংগত নয়, তোমরা অচিরেই তা জানতে পারবে।
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ	৪. আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ؕ	৫. সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ	৭. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে।
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ؕ	৮. আবার বলি, তোমরা অবশ্যই তা চাক্ষুষ প্রত্যয়ে দেখবে।
ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۠	৯. অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় ধন-সম্পদের মোহ ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ইত্যাদির প্রতি লোভী। প্রাচুর্য লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই মানুষের মৃত্যু এসে যায়। অথচ সে মৃত্যুর-পরবর্তী জীবনের জন্য কোনো প্রস্তুতিই নিতে পারে না। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, ধন-সম্পদ হলো ক্ষণস্থায়ী বিষয়। এগুলোর প্রতি মোহ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ আখিরাতের সাফল্য ও কল্যাণ এগুলোর তুলনায় কতই না উত্তম। মানুষের উচিত দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া। মানুষ যদি আখিরাতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করত, তবে কখনো দুনিয়ার প্রাচুর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতো না।

মৃত্যুর পর মানুষ আখিরাতকে বুঝতে পারবে। আখিরাতের নানা বিষয় প্রত্যক্ষ করবে। অথচ সে তখন কিছুই করতে পারবে না। বরং দুনিয়ায় প্রাপ্ত নিয়ামত সম্পর্কে সে জিজ্ঞেসিত হবে। দুনিয়ার লোভ-লালসা ও অন্যায়-অনৈতিকতার জন্য সে জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষা লাভ করি। যেমন:

১. সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতি মোহাচ্ছন্ন থাকা উচিত নয়।
২. সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে আখিরাত ভুলিয়ে দেয়।
৩. অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ উপার্জনকারী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।
৪. আখিরাতে সকল কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

অতএব, আমরা ধন-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা করব না। বরং বৈধভাবে প্রয়োজনমতো ধন-সম্পদ উপার্জন করব। আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনামতো খরচ করব। অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা করব না।

মুনাজাতমূলক আয়াত

মুনাজাত আরবি শব্দ। এর অর্থ পরস্পর চুপি চুপি কথা বলা। আদবের সাথে কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করাকে মুনাজাত বলে। আমাদের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুর জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট মুনাজাত করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ' তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।' (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ৬০) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন সম্পর্কে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।' (তিরমিযি)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের রব। তিনিই সবকিছু আমাদের দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত নিয়ামত তাঁরই দান। সুতরাং আমাদের উচিত তাঁরই কাছে সবকিছুর জন্য প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছু চাওয়ার মাধ্যম হলো মুনাজাত করা। মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের চাহিদা জানাতে পারি। আল কুরআনে মুনাজাতমূলক বহু আয়াত রয়েছে। এ পাঠে আমরা এরূপ তিনটি মুনাজাতমূলক আয়াত শিখব ও অর্থ জানব। এরপর এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট মুনাজাত করব।

আয়াত ১

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৩)

সর্বপ্রথম এ মুনাজাত হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করে জান্নাতে বসবাস করার নির্দেশ দেন। জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সকল নিয়ামত ভোগ করার অনুমতি দেন। শুধু একটি গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেন। কিন্তু আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) শয়তানের প্ররোচনায় ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। তাঁদের এ কাজের জন্য মহান আল্লাহ তাঁদেরকে বেহেশত থেকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। দুনিয়ায় এসে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন। তাঁরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের উপর্যুক্ত মুনাজাত শিক্ষা দেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এ মুনাজাতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দোয়া কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

এ আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা নানারকম পাপ করে থাকি। আমরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে থাকি। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত অপরাধসমূহ স্বীকার করা। অতঃপর এ মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন।

আয়াত ২

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ থেকে আমাদের প্রতি দয়া করো এবং আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করো।' (সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ১০)

মুনাজাতটি আসহাবে কাহফের যুবকগণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহফে তাঁদের ঘটনা ও মুনাজাত উল্লেখ করেছেন। আমাদের প্রিয়নবি (সা.)-এর আগমনের কয়েক শ বছর পূর্বের ঘটনা। দাকইয়ানুস নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। সে ইমানদারদের উপর খুব অত্যাচার করত। তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকজন যুবক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। তাঁদের সাথে একটি কুকুরও ছিল। তাঁদেরকে আসহাবে কাহফ বলা হয়। তাঁরা গুহাতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। গুহায় থাকাবস্থায় তাঁরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এ মুনাজাত করেন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁদের এ দোয়া কবুল করেন।

পুণ্যবান ব্যক্তিরা কখনোই আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ত্যাগ করেন না। শত অত্যাচারেও তাঁরা যথাযথভাবে মহান আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকেন। এ জন্য প্রয়োজনে নিজেদের ঘরবাড়ি, দেশ ত্যাগ করতেও পিছপা হন না। আমরাও তাঁদের মতো আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ছাড়ব না। বরং কোনো অসুবিধা দেখা দিলে আমরা মুনাজাতমূলক এ আয়াতটি পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব। ফলে তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমাদের সকল কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবেন।

আয়াত ৩

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ○ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ○ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ○ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ○

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।' (সূরা ত্বোয়া-হা, আয়াত: ২৫, ২৬, ২৭, ২৮)

মিসর দেশে ফিরাউন নামে এক বাদশাহ ছিল। সে ছিল খুবই অত্যাচারী, অহংকারী, দাম্ভিক এবং কুফরিতে চরমভাবে নিমজ্জিত। তার রাজ্য ছিল বিশাল এবং সৈন্য সংখ্যা ছিল অগণিত। বহু বছর ধরে তার শাসন চলে আসছিল। সে এতটাই দাম্ভিক ছিল যে, নিজেকে 'সর্বোচ্চ প্রভু' বলে দাবি করত। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.) কে প্রেরণ করেন তার নিকট দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। তখন মুসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দোয়াটি করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। তাঁর বক্ষকে ইমান ও নবুয়াতের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন, তাঁর দ্বীন প্রচারের কাজকে সহজ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর জিহ্বার জড়তাকে দূর করে দিয়েছিলেন, যাতে মানুষ তাঁর কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

আমরাও আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করব যেন তিনি আমাদের বক্ষকে ইমান, সৎকাজ ও জ্ঞানের জন্য প্রশস্ত করে দেন; লেখাপড়াসহ আমাদের সকল ভালো কাজকে সহজ করে দেন এবং আমাদের জিহ্বার জড়তাকে দূর করে দেন-যাতে আমরা সুন্দরভাবে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারি, মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলতে পারি।

বাড়ির কাজ: শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখার জন্য সুন্দর করে লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

আল-হাদিস

আল-হাদিসের পরিচয়

হাদিস (حَدِيْثٌ) আরবি শব্দ। শব্দটি একবচন, বহুবচনে আহাদিস (اَحَادِيْثُ)। এর শাব্দিক অর্থ হলো কথা, বাণী, কাজ, বার্তা, সংবাদ, খবর, বিবরণ ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, মহানবির (সা.)-এর বাণী, কর্ম, কর্মের সমর্থন বা অনুমোদনকে হাদিস বলে। অর্থাৎ নবি হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.) জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন, যা অনুমোদন দিয়েছেন এবং সাহাবিদের যে সমস্ত কাজ ও কথার প্রতি সমর্থন ও সম্মতি দান করেছেন তার সবগুলোই হাদিস।

হাদিসের গুরুত্ব

ইসলামি জীবনদর্শনের মূলভিত্তি আল-কুরআন এবং দ্বিতীয় ভিত্তি আল-হাদিস। আল-কুরআনে জীবনবিধানের মৌলিক নীতিমালা দিয়েছে এবং আল-হাদিসে সেই মৌলিক নীতিমালার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আল-হাদিস হচ্ছে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা, আল্লাহর রাসুল (সা.) এর জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তাঁর বাণী, কাজ ও নির্দেশনাবলির বিস্তারিত বিবরণ। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে চলতে ফিরতে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ সকল সমস্যার নিখুঁত সমাধান রয়েছে হাদিসের মধ্যে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য হাদিস অপরিহার্য । মানব জাতিকে ন্যায়-নীতি, সত্য ও শান্তির পথে আনতে দিকনির্দেশনা দেয় হাদিস। মুসলমানদের জীবনে হাদিস অধ্যয়ন ও চর্চা খুবই জরুরি।

শরিয়তের উৎস হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব

ইসলামি জীবন বিধানের মূল উৎস হলো কুরআন ও হাদিস। পবিত্র কুরআন হলো ইসলামের মৌলিক ভিত্তি এবং হাদিসে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের নমুনা পাওয়া যায়। হাদিস আল-কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা। হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় অপরিহার্য উৎস। কুরআনের পরেই হাদিসের স্থান। হাদিস হচ্ছে রাসুল (সা.)-এর জীবনলেখ্য ও কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই ইসলামি শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে যেসব নিয়ম-কানুন সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে হাদিসে। উদাহরণস্বরূপ, সালাত ও সাওমের কথা বলা যেতে পারে। কুরআন শরিফে বলা হয়েছে, সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও। হাদিসে কীভাবে সালাত আদায় করতে হবে, কখন সালাত পড়তে হবে এবং কী পরিমাণ যাকাত দিতে হবে, কাকে দিতে হবে, কোন কোন সম্পদের যাকাত দিতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা উঠে এসেছে। এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার-আচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি-চুক্তি, বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান পাওয়া যায় হাদিসে। এ ছাড়া মানবাধিকার, প্রাণীর অধিকার, পরিবেশের সংরক্ষণসহ মানব জীবনের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ রয়েছে হাদিসে। এমনকি মানুষের স্বাস্থ্যগত সকল প্রকারের নির্দেশনা রয়েছে হাদিসে।

সর্বোপরি মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের প্রতিটি বিষয় নিখুঁতভাবে পরিচালনা করার জন্য হাদিসের নির্দেশনা একান্ত প্রয়োজন।

কোনো মুসলমান হাদিসকে অস্বীকার করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা রাসুল (সা.)-এর সকল কাজকে গ্রহণ করতে বলেছেন এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করতে বলেছেন। এ বিষয়ে কুরআন শরিফে ঘোষণা করা হয়েছে,

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থ: 'রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো।' (সূরা হাশর, আয়াত: ০৭)

মানবজাতিকে সুপথে পরিচালিত করার বাস্তব নির্দেশনা রয়েছে হাদিসে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

অর্থ: 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যদি তা শক্তভাবে ধরে রাখো তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ বা হাদিস।' (মুয়াত্তা মালিক)

হাদিসের প্রকারভেদ

হাদিসের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। মূল বক্তব্য, বর্ণনাকারীর সংখ্যা বিবেচনায় হাদিসের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে শিখব। বর্তমানে আমরা মূল বক্তব্য অনুসারে হাদিসের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে জানব। মূল বক্তব্য অনুসারে হাদিস তিন প্রকার। যথা- কওলি হাদিস, ফেলি হাদিস ও তাকরিরি হাদিস।

১. কওলি হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْقَوْلِى): যে সব হাদিসে মহানবি (সা.)-এর নিজ বাণী বর্ণিত হয়েছে তাই কওলি হাদিস বা বাণীসূচক হাদিস।

২. ফে'লি হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْفِعْلِى): যে সব হাদিসে মহানবি (সা.)-এর কাজ, কর্ম, আচার-আচরণের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে এমন ধরনের হাদিসকে ফে'লি হাদিস বা কর্মসূচক হাদিস বলে।
৩. তাকরিরি হাদিস (اَلْحَدِيْثُ التَّقْرِيْرِى): যে হাদিসে সাহাবিগণের কোনো কথা, কর্ম বা আচার-আচরণের প্রতি মহানবি (সা.)-এর মৌন সম্মতি বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল হাদিসকে তাকরিরি হাদিস বলে।

হাদিস গ্রন্থসমূহ

সিহাহ সিত্তার পরিচয়

সহিহ (صَحِيْحٌ) আরবি শব্দ যার অর্থ হলো বিশুদ্ধ বা নির্ভুল। বহুবচনে সিহাহ (صِحَاحٌ)। আর সিত্তাহ (سِتَّةٌ) অর্থ হলো ছয়। অতএব সিহাহ সিত্তাহর শাব্দিক অর্থ হাদিসের ছয়খানা বিশুদ্ধ গ্রন্থ। মহানবি (সা.)-এর হাদিস সংকলনের অসংখ্য গ্রন্থ থেকে সর্বোত্তম বিশুদ্ধ ছয়খানা গ্রন্থকে 'সিহাহ সিত্তাহ' বলে। এ ছয়খানা হাদিসগ্রন্থ হলো বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ।

(১) বুখারি: ইমাম বুখারি (রহ.) ১৬ বছর সাধনা করে বিশ্ববিখ্যাত 'সহিহ আল বুখারি' গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁরই নামানুসারে সহিহ বুখারি নামকরণ করা হয়। ইমাম বুখারি (রহ.) তার সংগৃহীত ছয় লক্ষের অধিক হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে ৭৭৬১টি হাদিস সন্নিবেশ করেন। তিনি হাদিস সংগ্রহের সময় খুবই আন্তরিক ও সতর্ক ছিলেন। সন্দেহ সৃষ্টি হলে সে হাদিস গ্রহণ করতেন না। তিনি হাদিস গ্রন্থসংকলন করার সময় রোজা রাখতেন, গোসল করতেন এবং দু'রাকাআত এস্তেখারা নামাজ আদায় করতেন। এ জন্যই বিশ্ব দরবারে 'বুখারি' সর্বোচ্চ প্রশংসিত বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

(২) মুসলিম: ইমাম মুসলিম (রহ.) ১৫ বছর পরিশ্রম করে 'সহিহ মুসলিম' সংকলন করেন। তাঁর নামানুসারে 'সহিহ মুসলিম' নামকরণ করা হয়। তিনি ৩ লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে ৪ হাজার হাদিস এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেন।

(৩) আবু দাউদ: ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর নামানুসারে 'সুনান আবু দাউদ' নামকরণ করা হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ৫ লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে ৪ হাজার ৮ শত হাদিস এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেন।

(৪) নাসাঈ: ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর নামানুসারে 'সুনান নাসাঈ' নামকরণ করা হয়। নাসাঈ শরিফে মোট ৪৪৮২টি হাদিস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৫. তিরমিযি: ইমাম তিরমিযি (রহ.)-এর নামানুসারে 'জামে' তিরমিযি' নামকরণ করা হয়েছে। তিরমিযি শরিফে ৫ লক্ষ হাদিস থেকে বাছাইকৃত ১৬০০ হাদিস সন্নিবেশিত করেন।

৬. ইবনে মাজাহ: ইবনে মাজাহ (রহ.)-এর নামানুসারে 'সুনান ইবনে মাজাহ' নামকরণ করা হয়েছে। ইবনে মাজাহ (রহ.) কয়েক লক্ষ হাদিস থেকে মাত্র ৪ হাজার হাদিস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেনে।

মুনাজাতমূলক ৩টি হাদিস

মুনাজাত অর্থ দোয়া, প্রার্থনা ইত্যাদি। মুনাজাত আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমল। আল্লাহ চান বান্দা যেন বেশি বেশি প্রার্থনা করে। মুনাজাত একা একা করা যায় আবার কয়েকজন মিলে একত্রিত হয়েও করা যায়। মুনাজাত আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও নবির উপর দরুদ পাঠের মাধ্যমে শুরু করা উত্তম। কীভাবে মুনাজাত করতে হয় তা মহানবি (সা.) শিখিয়ে দিয়েছেন। নিম্নে মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস উপস্থাপন করা হলো–

হাদিস ১

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

অর্থ: 'হে মহান আল্লাহ! আপনি যেভাবে আমাকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে আপনি আমার চরিত্রও সুন্দর করে দিন।' (মুসনাদে আহমাদ)

হাদিস ২

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

অর্থ: 'হে মহান আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন, আমাকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন।' (মুসলিম)

হাদিস ৩

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থ: 'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীন তথা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।' (তিরমিযি)